বিদ্যালয়ে না যাওয়ার অনুভূতি

বিদ্যালয় বন্ধ। দীর্ঘদিন স্কুলে যেতে না পারার জন্য শিশুদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তা বড়দের জানা প্রয়োজন। এখানে শিশুরা নিজেদের কলমে তাদের অনুভুতি প্রকাশ করেছে। সমপথের পাঠকদের জন্য শিশুদের নিজেদের কথা প্রকাশ করা হল।

আমি শ্রেয়া পানিগ্রাহী। বটতলা আনন্দময়ী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার অনুভূতিটি নিজের ভাষায় পত্রে উল্লেখ করছি।

ভূমিকাঃ বর্তমান কালে বিশ্ব যে মহামারির কবলে

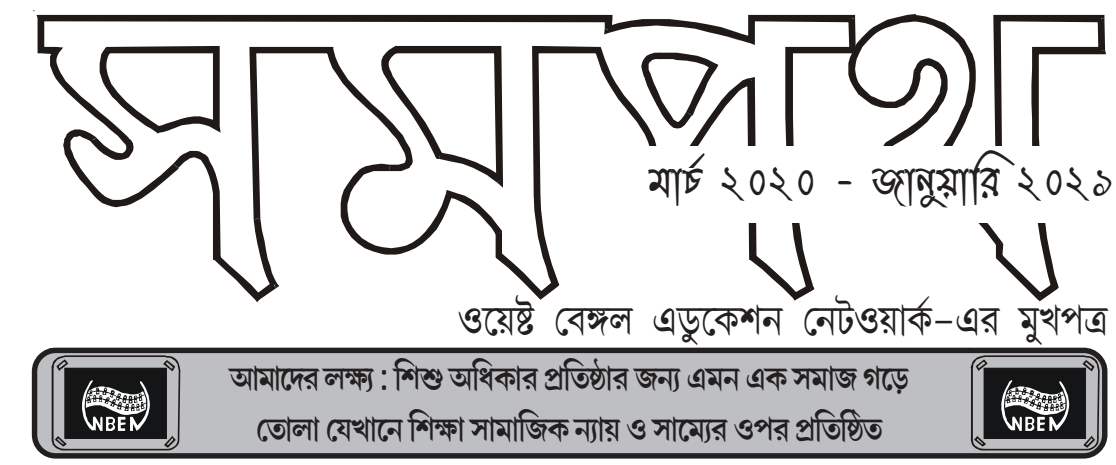

তথ্যপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে আমাদের পঠনপাঠন প্রতিনিয়ত চালাতে অক্ষম হয়েছি, এটা মোটেও আমরা মানসিক দিক থেকে মেনে নিতে পারছিনা। তাই আশা করি এসবের থেকে বাহির হয়ে আমাদের সেই স্কুল জীবনে প্রবেশ করব।

মহামারির প্রভাবঃ করোনা ভাইরাসের মতো একটি মহামারি আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রাকে বিপন্ন করে তুলেছে। আমাদের মতো প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পড়াশোনাকে প্রতিনিয়ত চালাতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। যেন বিশাল মানসিক রোগে আমরা রোগগ্রস্থ হয়ে আমাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি, দিনের পর দিন আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে পড়েছে। আমরা ছাত্রছাত্রীরা প্রতিনিয়ত সঠিকভাবে আমাদের পড়াশোনা চালাতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। করোনা ভাইরাসের সময় পড়াশোনা বন্ধ থাকার জন্য আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে পড়াশোনার বিষয়ে কোনো রকম সাহায্য পাচ্ছি না।

বিদ্যালয়ে সময় কাটানো ঃ বিদ্যালয় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এক আদর্শ মন্দিরের মতো, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের কাছে ভগবানের মতো। প্রতিদিনের বেশিরভাগ সময় আমরা বিদ্যালয়ে কাটাতাম। বিভিন্ন ধরনের সহপাঠী সহপাঠীনীদের সঙ্গে মেশার ফলে আমরা আমাদের শিক্ষার পরিমান বৃদ্ধির করার চেষ্টা করি। বিদ্যালয়ে যাওয়ার ফলে পড়াশোনার মতো একটি আদর্শ কাজ আমরা চালিয়ে রাখতে সচেষ্ট হই। শিক্ষক শিক্ষিকাদের সান্নিধ্যে আমরা প্রসন্ন হয়ে থাকি। বিদ্যালয় বন্ধ থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন সৃজনশীল চিন্তাভাবনা থেকে বঞ্চিত হই। কারণ একমাত্র বিদ্যালয়েই সৃজনশীল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই শিক্ষা প্রতিস্থানটি বন্ধ থাকায় আমরা ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার জন্য বিদ্যালয় থেকে তথ্যপ্রযুক্তির দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা গ্রহন করা হয়েছে। এটা একদিক থেকে যেমন সুবিধাজনক তেমনি অন্যদিক থেকে সমানভাবে অসুবিধাজনক। সুবিধা জনক বলার কারণ - শহরতলিতে ছাত্রছাত্রীরা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। অসুবিধাজনক বলার কারণ আজও এমন গ্রাম আছে যেখানে বিদ্যুৎ এখনও পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। তাই তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালানো গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অসম্ভব একটি ব্যাপার।

বিদ্যালয়ের সহচর্যঃ প্রথমশ্রেণী থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিমমূহুর্ত পর্যন্ত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সঙ্গী পড়াশোনা প্রতিনিয়ত চালানোর জন্য। বিদ্যালয়ে প্রথমদিন যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমরা কেউই কোনোদিনও ভুলতে পারিনা। বিদ্যালয় আমাদেরকে বিশেষভাবে সান্নিধ্য প্রদান করে থাকে। তাই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা বিদ্যালয়ে না যেতে পেরে বা বিদ্যালয় বন্ধ থাকার জন্য বিশেষ ভাবে দুঃখিত।

উপসংহারঃ ভগবানের তথা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে শিক্ষাকালে আমরা আজ স্কুলে না গিয়ে শিক্ষকদের অনুগামী না হতে পেরে মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছি। তার সাথে আমরা আমাদের সহপাঠী-সহপাঠীনীদের থেকে অনেকটাই দূরে চলে যেতে হয়েছে। মহামারীর কারণবশত আমাদের আমাদের সকলের একটাই কামনা, করোনা ভাইরাসের মতো এক ভয়হকর মহামারি যেন সমগ্র বিশ্ব থেকে দূর হয়। এই ভাইরাসকে কাটানের জন্য বিশ্বের প্রায় সমগ্র চিকিৎসকেরা সচেষ্ট হয়েছেন। আর আমাদের একটাই অনুরোধ করোনা ভাইরাসের নিয়মবিধি মেনে বিদ্যালয় যত শীঘ্র খুলবে, আমরা বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীরা তাতে বিশেষ ভাবে উপকৃত হব।

শ্রেয়া পানিগ্রাহী, শ্রেণী-একাদশ, বিদ্যালয়-বটতলা আনন্দময়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মোবাইল নং - ৭৩৫৪০২২৬৪০

বিদ্যালয়ে না যাওয়ার অনুভূতি

ভূমিকাঃ শিক্ষা জাতীর মেরুদন্ড। এক সময় শিক্ষা ছিল আশ্রম কেন্দ্রিক, আশ্রমে থেকেই গুরুর কাছে থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। আদর্শ বিদ্যালয় হলো এক একটি আশ্রম স্বরূপ। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সময় আপন গতিতে বহমান। এই বহমানতার ধারায় এগিয়ে চলে মানুষের জীবন। অর্থাৎ আমাদের বিদ্যালয় আমাদের কাছে শিক্ষার আশ্রম। সেই আশ্রমের গুরু অর্থাৎ আমাদের শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগণ। এমনি হল একটি আশ্রম আমার বিদ্যালয়। এটির নাম নয়াপুট সুধীর কুমার হাই স্কুল।

৩ পাতায় শেষাংশ...

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

প্রার্থীর কাছে দ

সম্পাদকীয়

নির্বাচন ও শিশুর অধিকার

স্কুল এখনও বন্ধ। কবে খুলবে ঠিক নেই। শিশুরা ঘরবন্দী। শৈশবের স্বাভাবিক ছন্দ অনেক আগেই আমরা বড়রা শিশুদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি। লকডাউন যেটুকু শৈশব অবশিষ্ট ছিল তাও কেড়ে নিয়েছে। বাড়িতে বন্দী অবস্থায় অভিভাবকদের শাসন বেড়েছে। স্কুল বন্ধ থাকার কারণে বাল্যবিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধির খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। স্কুল ছুট শিশুদের শিশু শ্রমিক হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অনলাইন শিক্ষার সুযোগ থেকে সংখ্যাগুরু শিশুই বঞ্চিত। ডিজিটাল বৈষম্য সমাজের এক নতুন বিভাজন। অনলাইন শিক্ষার সুযোগ নিতে না পারার কারণে আত্মহত্যার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত। অথচ আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে একটি আইন আছে। শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য রয়েছে সরকারের নানা দপ্তর। আছে বিভিন্ন সংগঠন। আলোচনা, প্রকাশনার কোনো কিছুরই ঘাটতি নেই। কিন্তু শিশুদের সমস্যা সেই তিমিরেই। শিশুদের ভোট নেই। তাই বছর বছর নির্বাচনে শিশুদের সমস্যাগুলি কখনও নির্বাচনে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে না।

নতুন বছরে আমাদের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠেছে। পরস্পর পরস্পরের নিন্দা, দোষারোপ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু শিশুদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্যে গুরুত্ব পাচ্ছে না। শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত আমাদের মতো ছোট ছোট সংগঠনগুলির দায়িত্ব শিশুদের সমস্যাগুলি সকল স্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং রাজনৈতিক দলগুলির কাছে দাবি করা শিশু অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য। কারণ আজকের শিশুরাই আগামীর নাগরিক। শিশুরা সুরক্ষিত না থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত থাকবে না। নাগরিকরা সুরক্ষিত না থাকলে দেশও সুরক্ষিত থাকবে না। এই সত্য যত দ্রুত বেশি বেশি মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে, ততই শিশু এবং দেশের পক্ষে মঙ্গল। আমাদের সকলের দায়িত্ব এই সত্যকে তুলে ধরা এবং প্রচারে নিয়ে আসা। আমাদের সামর্থ্য যত ক্ষুদ্রই হোক, সকলে মিলে একসাথে এগিয়ে আসলে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আসুন আমরা সবাই মিলে সেই চেষ্টাই করি। আগামী নির্বাচনে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠুক শিশুর অধিকার, বিকাশ ও সুরক্ষা।

পুস্তক পরিচিতি

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য

গত ৭ নভেম্বর, ২০২০ একটি অনলাইন আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর উদ্যোগে। আলোচনার শুরুতে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর পক্ষে সকলকে স্বাগত জানান আবীর চক্রবর্তী। স্বপন কুমার দাস বলেন, নিজেকে জানা ও আত্মশক্তির বিকাশ হল প্রকৃত শিক্ষা। ওয়েবিনারের মূল বক্তা দিব্যগোপাল ঘটক বলেন, আমরা প্রচলিত রাস্তার বাইরে হাঁটতে চাই। তিনি বলেন, আমরা শিক্ষিত মানুষরা প্রত্যেকে যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়েছি। আদৌ কোনও জীবন বোধ গড়ে উঠছে কি? অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে কি? প্রকৃতি, সমাজ সবাই শিক্ষক। ক্লাসের শিক্ষার সাথে জীবনের সম্পর্ক নেই। শিশু সমাজ থেকে শেখে। শিশুর অবাস্তর ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি শিশুদের শেখার ৮টি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন। শব্দের সাথে চিন্তনের সম্পর্ক নিয়েও তিনি আলোকপাত করেন। দেবাশিস মণ্ডল জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্থানীয় জ্ঞান ও স্কুল পাঠের সাথে সংযোগের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

এই আলোচনার মূল প্রেক্ষাপট ছিল অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা 'চেনা ছকে অচেনা কথা'। ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়েছে, 'চেনা ছকে অচেনা কথা-১', 'চেনা ছকে অচেনা কথা-২' চেনা ছকে অচেনা কথা-৩, এবং 'চেনা ছকে অচেনা কথা-৪'। প্রতিটি পুস্তিকাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। পুস্তিকার 'প্রাসঙ্গিক কথা'য় বলা হয়েছে, ''যদি আমরা ২০০৫ সালের 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা'য় আলোকপাত করি তাহলে দেখব,সেখানে বলা হয়েছে শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক পড়াশোনাই শিক্ষকের একমাত্র হাতিয়ার নয়। পাশাপাশি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা ও মানসিক আকাঙ্খা পূরণেও সহায়তা করতে হবে। শিশুদের জ্ঞানের মধ্যে স্থানীয় জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের একটা সংযোগ ঘটাতে হবে, যাতে শিশুরা তাঁর চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে একাত্ম হতে পারে। শিশুর পরিবার, গোষ্ঠী, ভাষা, এবং সংস্কৃতি যে পৃকৃত মূল্যবান সম্পদ তা তাঁদের অনুভব করানো প্রয়োজন।''

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখাকে মাথায় রেখেই এই দিশা-পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাই 'প্রাসঙ্গিক কথা'য় বলা হয়েছে, ''শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেরকম ভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করান সেটা করাবেন। তার পাশাপাশি এই কৃত্যলিগুলি সম্পাদন করলে শিশুরা একদিকে যেমন আনন্দ পাবে তেমনই অন্যদিকে হাতে-কলমে কাজ করতে করতে দক্ষতা ও জ্ঞান উভয়ই বাড়াতে পারবে। পাঠগুলির অভ্যন্তরে নিহিত শিশুর সামর্থ্য ও মূল্যবোধের ধারণা বৃদ্ধি করতে যেহেতু সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি নির্মাণ করা হয়েছে, তাই এই উদ্যোগের সঙ্গে সরকারি পাঠক্রম, শিক্ষাদর্শন, শিশুর মনস্তত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিশিষ্ট ভাবনাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। সেগুলিকেই শিক্ষকদের কাছে স্পষ্টভাবে এই দিশা-পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতাও তৈরি হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে মূল্যবোধের ভিত্তিকে দৃঢ় করে তুলবে।''

'প্রস্তাবনা'র শেষাংশে যথার্থই বলা হয়েছে, ''শিক্ষকগণ এই দিশা-পুস্তিকার সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজবোধ, পরিবেশ চেতনা ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তিতে নতুন নতুন আরও অনেক কৃত্যালি নির্মাণ করতে পারবেন এবং শিক্ষাদানও অনেক বেশি আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারবে। শিক্ষার্থীর পরিচিত আঞ্চলিক জ্ঞান ও বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই কৃত্যালিগুলি পাঠ্য বইয়ের পাঠখণ্ডগুলিকে আরও সহজবোধ্য এবং আন্তরিক করে তুলতে পারবে।''

পুস্তিকায় গুণগত মানের শিক্ষা এবং শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার সূত্র সন্ধান করা হয়েছে। শিখনের আটটি সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠ্যবই এর বিষয় ভিত্তিক কৃত্যালি নিয়ে আলোচনাগুলি শিক্ষকদের অনেক কাজে লাগবে। এই ধরনের প্রকাশনা সত্যিই প্রয়োজন ছিল।

সংগঠন সংবাদ

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবছরও আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস পালন করা হল গত ২০ নভেম্বর, ২০২০ কলকাতার রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে। স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী। এদিনের অনুষ্ঠানে শিশু সুরক্ষায় অবদানের জন্য মোট ২৫ জন শিশুকে বীরাঙ্গনা ও বীরপুরুষ পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানানো হয়। লকডাউনের সময় শিশুদের ঘুড়ি তৈরির প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপক শিশুদের এদিনের অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক এবং সাংবাদিক যারা শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদেরকেও পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। শিশু সুরক্ষা আয়োগের সকল সদস্যই এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন আর জে শেখর। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুদেষ্ণা রায়। বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকেও একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বীরাঙ্গনা পুরস্কার প্রাপ্ত দুই শিশু

শিক্ষা বৈঠক ও ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের যৌথ আলোচনা

গত ২ ডিসেম্বর, ২০২০ শিক্ষা বৈঠক এবং ওয়েষ্টে বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের উদ্যোগে নতুন শিক্ষা নীতি নিয়ে এক যৌথ আলোচনার আয়েজন করা হয়েছিল। আলোচনার শুরুতে আশীস কুমার রায় শিক্ষা বৈঠকের কাজের ধারা নিয়ে আলোচনা করেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা এবং প্রবীর বসু ফোরামের ইতিহাস, শিক্ষা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে ভাবনার আদান-প্রদানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। নতুন শিক্ষা নীতি নিয়ে আলোচনা করেন বিনয় কুমার ওঝা, বন্দনা ভট্টাচার্য ঘটক, মনীষা ভট্টাচার্য, বিজলী মল্লিক, বিপ্লব দাস, তুলিকা দাস, পার্থ রায় প্রমুখ শিক্ষক শিক্ষিকা ও সমাজকর্মীবৃন্দ। নতুন শিক্ষানীতির ইতিবাচক দিক, সীমাবদ্ধতা, প্রয়োগের সমস্যা বিষয়ে আলোকপাত করেন বক্তাবৃন্দ। সর্ব শিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন অর্নব সরকার। এই বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে, সকলেই একমত হন।

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ-এর উদ্যোগে ঘুড়ি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ঘুড়ি।

বিদ্যালয়ে না যাওয়ার অনুভূতি

১ পাতার শেষাংশ...

বিষয়বস্তুঃ বিদ্যালয়ে যেমনই আমরা গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি তেমনিই আমরা আমাদের গুরু অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষীকার কাছ থেকে ভালোবাসা পেয়ে থাকি। তেমনি আমরা আমাদের বন্ধু ও বান্ধবীর সাথে কথাবার্তা বলে ও পড়াশোনার বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে সেই বিষয়বস্তু আগের থেকে আরও সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণে আমাদের অর্থাৎ ছাত্র ও ছাত্রীদের মনের ওপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণে আমাদের পড়াশোনার দিক থেকে অনেকটা খারাপ প্রভাব পড়ছে। আমাদের গুরুর কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে না পারায় আমাদের ওই পড়াটা বোঝার জন্য প্রচুর পরিমানে অসুবিধা হয় অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা গ্রহনের পথে চলতে গেলে গুরু অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষীকার প্রচুর পরিমানে প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণে ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে আরও একটি কুপ্রভাব দেখা যায় সময় বজায় রাখা। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার ফলে সময় বজায় রাখা হয় না। বিদ্যালয়ে গেলে সময়ে-সময়ে খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন বিষয় পড়াশোনা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার ফলে আমাদের মধ্যে সময় সময়ে বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ টাইম মেনটেন করার প্রচুর পরিমানে অসুবিধা হয়। একজন ছাত্র ও ছাত্রীর যেমন পড়াশোনা করা প্রচুর পরিমানে প্রয়োজন তেমনি খেলাধূলাও প্রয়োজন। খেলাধূলা করলে মন ভাল থাকে যেমনই শরীরও সুস্থ ও সবল থাকে। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণে মনের দিকেও যেমন খারাপ প্রভাব পড়ে,তেমনি আমাদের শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়। অর্থাৎ শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। অতএব ছাত্র ও ছাত্রীদের জীবনে বিদ্যালয়ে যাওয়ার ফলে প্রচুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে।

উপসংহারঃ এদেশে শিক্ষার হার বাড়ার ফলে বিদ্যালয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীদের ওপর বিদ্যালয়ের প্রভাব বিস্তার করে। এদেশে শিক্ষার হার বাড়ার পরেও সাক্ষরতার হার লজ্জাজনক। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার ফলে শিক্ষার প্রভাব ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার হার বাড়িয়ে তোলার জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়ার খুবই প্রয়োজন।

রাখী কর, শ্রেণী - নবম, বিদ্যালয় - নয়াপুট সুবীরকুমার হাই স্কুল

বিদ্যালয়ে না যাওয়ার অনুভূতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন - ‘‘আমি কিন্তু সবচেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা, তাহা কিছু লাভ নহে, তাহা কেবলমাত্র রাস্তা, এই রাস্তা না হইলেই মানুষ আপনার কোনে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে।’’ শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তায় পরিপূর্ণ বিকাশ। একজন শিক্ষার্থীকে যদি একটি নলের গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে একটি ফল গাছ সঠিকভাবে বেড়ে উঠে ফল দেওয়ার জন্য যেমন একটি উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন হয়, ঠিক সেইভাবে একজন শিক্ষার্থীকে বর্তমানের চারাগাছ থেকে ভবিষ্যতের মহীরুহতে পরিনত করতে যে উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন, তা হলো বিদ্যালয়। কিন্তু এই রাস্তাই যদি বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ যদি এই পরিপূর্ণতার বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে কবিগুরুর কথায় ‘‘সবাই আপনার কোনে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে।’’ তাই শিক্ষাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন যা মানুষকে বিকাশের দিকে নিয়ে যায়, অন্ধাকার থেকে আলোর উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়।

কথায় বলে ‘মানুষ পরিস্থতির শিকার’, এখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। এখন এই করোনা পরিস্থিতির যা সারা বিশ্বে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে, সারা বিশ্বের মানুষ আজ গৃহে বন্দি। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষ আজ অসহায়, নিরুপায় জীবের মতো জীবন যাপন করছে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় সংক্রমনের ভয়ে আজ সবকিছুই স্তব্ধ, পৃথিবীর গতি হঠাৎ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

ঠিক সেইভাবেই দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে সকল শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের প্রধান আধার, অন্ধকার থেকে আলোক দিশায় গমনকারী পথের প্রধান সঙ্গী, আমাদের বিদ্যালয়। বিদ্যালয় শুধুমাত্র ইঁট, কাঠ, পাথরের ঘর-বাড়ী নয়, তা সকল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের আলোকময় পথে পৌঁছানোর প্রধান সেতু, প্রাণের বন্ধু। এই বিদ্যালয় থেকেই একজন শিক্ষার্থী পায় বন্ধু, পায় শিক্ষক। পায় জীবন গঠনের মূল রসদ। তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একজন শিক্ষার্থীর বন্ধুত্বপূর্ণ মিলন গড়ে ওঠে।

ঠিক সেইভাবে আমিও একজন শিক্ষার্থী, একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র, বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমারও গড়ে উঠেছিল উঠেছে অকৃত্রিম সখ্যতা, অজানা টান। তাই বিদ্যালয়ে যাওয়াটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই যে বললাম আমরা পরিস্থিতির শিকার। এই পরিস্থিতির কঠোর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বন্ধ হয়েছে স্কুল, বন্ধ হয়েছে আমার স্কুলে যাওয়া আসা, বন্ধ হয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া, বন্ধ হয়েছে শিক্ষকদের কাছে পাওয়া, সর্বোপরি বন্ধ হয়েছে একজন শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণতার বিকাশ, যা বিদ্যালয় ছাড়া অসম্ভব। এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে শরীরে প্রাণ থাকা সত্ত্বেও নির্জীব, অসহায়, অর্ধমৃত প্রাণী। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা মানুষ সঞ্চয় করে, সেটা ভালোও হয় আবার খারাপও হয়। এই বছরের যে দিনগুলি কেটে চলেছে, তা আমরা জীবনে সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্যতম হয়ে থাকবে।

যাই হোক সব খারাপের পর যেমন ভালো হয়, যেমন অন্ধকার রাত্রির পর আবার প্রভাতের সূর্য প্রতিভাত হয়, ঠিক সেইভাবে আমরা সকল শিক্ষার্থীরাই চাতক পাখির মতো অধীর আগ্রহে বসে আছি করে এই ভয়ঙ্কর, দুঃস্বপ্নময় পরিস্থিতির অবসান ঘটবে, কবে আবার সফলতার নতুন সূর্য উদিত হবে অর্থাৎ সবকিছুই আবার আগের মতো স্বাভাবিক হবে এই আশায়, আবার আমরা বিদ্যালয়ে যেতে পারবো এই আশায়, আবার বিদ্যালয়ের সঙ্গে - আমাদের গভীর, নিবিড় সেঁতুবন্ধন গড়ে উঠবে এই আশায়। আশা করি আমরা সবাই মিলে এই অসম যুদ্ধ জয় করবোই।

নাম - ইন্দ্রনীল সাই, শ্রেণী - একাদশ, বিদ্যালয়ের নাম - কাঁথি হাই স্কুল
গ্রাম ও পোষ্ট - সরদা, পুলিশ স্টেশন - কাঁথি, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর
পিন নং - ৭২১৪২৭, মোবাইল নং - ৭৮৭২৯৬৩২৫৭

I Cannot Play

Corona Situation, a Great threat to life. We should know that we are spending these days through a lot of troubles and turbulances throughout our life. The corona virus problem one of many problems today. All people of the world are badly effected by the virus. So, we, the people of West Bengal, are not exception of this vital situation. Like others, we are bound to follow many guidances to protect ourselves. Day by day, the virus is changing its function and structure chemically and also effecting our health as much as. To remove the virus totally from our world, many scientists are researching on the case so that they help people to save their lifes from the fatal situation. Till discovering of the vaccine of COVID-19, we have to protect ourselves, following many rules of doctors. Moreover, this situation is giving many bad experiences day by day. In my view, it is the first situation in my life where I am spending my times through this pandemic situation. I can't enjoy my days with my friends like before days. I can't meet my so many friends, relatives and teachers.

I am not getting the spirit, energy and confidence in any works, mainly in the studying. Moreover, I really can't chashing after the whole syllabus with the great time. so, the pressure of completing sylabus is increasing day by day. Through these incidents, I feel very monotonious day by day. I cannot play, move around, meet, for which my mind is not fresh all time.I am in depression sometimes. All of these are athe havoc problems for me now. Reading of mine is hampering much & much not to having the right guidance of teachers of school and tutions. Having no simple life like before the COVID- 19, I feel more boaring. School provides the facilities,skill of studying, which this time I do not get. Offline class in school is best for me but now, this online class is not so beneficial. This is more irritating for me. This experience of mine scrill still glow in my memory for ever and ever.

Name : Arindam Dutta, Class : X, School: Parulia Modern High School

শিক্ষা সংস্কার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'শিক্ষা সংস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'ভান্ডার' পত্রিকায় ১৩১৩ সনে প্রকাশিত হয়। এই লেখাটি আজও প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সমপথের পাঠকদের জন্য এখানে প্রকাশ করা হল। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'শিক্ষা' গ্রন্থ থেকে এই লেখাটি নেওয়া হয়েছে। আমরা বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কাছে কৃতজ্ঞ।

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, ইংলন্‌ডে, ফ্রান্‌সে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিন্ত নাই তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

এমন সময়ে স্পীকার-নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে আইরিশ শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

য়ুরোপের যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্বর-আক্রমণের ঝড়ে রোমের বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়র্লন্‌ডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়া ছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়র্লন্‌ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল তখন তাহারা আহার বাসা পুঁথি এবং শিক্ষা বিনা মূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মতো আর-কি।

য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগিগণ বিদ্যা এবং খৃষ্টধর্মের নির্বাণপ্রায় শিখা আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ফ্রান্‌সের রাজা শার্‌ল্‌-মান অষ্টম শতাব্দীতে পারিস য়ুনিভর্সিটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পণ্ডিত ক্রেমেন্‌সের হাতে দিয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষা দ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজরা আয়র্লন্‌ড্‌ আক্রমণ করে তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়র্লন্‌ডের যে যে স্থান এই-সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল আয়র্লন্‌ডের স্বায়ত্ত বিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়র্লন্‌ড্‌বাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহাদের ভাষা নিকৃষ্ট সমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল।

অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ন্যাশনাল স্কুল প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞান-পিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগুলি বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে হইাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়োলোক, টুয়ামের আরচ্‌বিশপ, জন ম্যাক্‌হেল্‌, এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাক্‌সনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল স্কুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয় তখন আয়র্লন্‌ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল। আইরিশ ভূবৃত্তান্তও ভালো করিয়া শেখানো হইত না। ছেলেরা বিদেশের ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত শিখিয়া নিজের দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত।

ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানবিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশভাষী ছেলেরা বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।

ইহার কারণ, এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা - Intermediate Education। আটশ বৎসর ধরিয়া আয়র্লন্‌ডে সেই মাধ্যমিক শিক্ষার পরখ করা হইয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ বিদ্যাশিক্ষা সেখানে একেবারে দলিত হইয়া গেল।

পরীক্ষা ফলের প্রতি অতিমাত্র লোভ করিয়া, কলেজে শেখাইবার চেষ্টা হয় না — কেবল গেলাইবার আয়োজন হয়। ইহাতে হাজার হাজার আইরিশ ছাত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট এবং বুদ্ধি বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। অতিশ্রমের দ্বারা অকালে তাহাদের মান জীর্ণ হইয়া যায় এবং বিদ্যার প্রতি তাহাদের অনুরাগ থাকে না।

এই বিদ্যাবিভ্রাটের প্রতিকারস্বরূপ আইরিশ জাতি কী প্রার্থনা করিতেছে? তাহারা বিপ্লব বাধাইতে চায় না, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাহার নিজের হাতে চালাইতে চায়। ব্যয়ের জন্যও কর্তৃপক্ষকে বেশি ভাবিতে হইবে না। শিক্ষা-ব্যয়ের জন্য আয়র্লন্‌ডের যে বরাদ্দ নির্দিষ্ট হইতেছে তাহা অতি যৎসামান্য। ইংলেন্‌ডে পুলিশ এবং আদালতে যে খরচ হয় তাহার প্রত্যেক পাইন্‌ডের হারে বিদ্যাশিক্ষায় আট পাউন্‌ড খরচ ইহয়া থাকে। আর আয়র্লন্‌ডে যেখানে অপরাধের সংখ্যা তুলনায় অত্যন্ত কম, সেখানে পুলিশ ও আদালতের বরাদ্দের প্রত্যেক পাউন্‌ডের অনুপাতে বিদ্যাশিক্ষায় তেরো শিলিং চার পেন্‌স্‌ মাত্র ব্যয় ধরা হইয়াছে।

ঠিক একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সকল অংশের তুলনা হইতেই পারে না। আয়র্লন্‌ডের শিক্ষানীতি যে ভাবে চলিয়াছিল, ভারতবর্ষেও যে ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু আয়র্লন্‌ডের শিক্ষাসংকটের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা গভীর জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না, আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয় সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। তত দিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি পেটা এবং কুলূপ খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো-চোদ্দের বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোর এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে; সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থবিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া? প্রায় বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত মারামারির পর ইংরেজি ভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু ততদিন আমাদের মন কী খোরাকে বাঁচিয়াছে? আমরা কী ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কী রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টিকার্যচর্চার জন্য কী উপকরণ লাভ করিয়াছে? যাহা গ্রহণ করি তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত, প্রকাশ

করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চা না থাকাতে যাহা শিখি তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। Key মুখস্থ করিয়া, শেখা এবং লেখা দুয়ের কাজ চালাইয়া দিতে হয়। যে বয়সে মন অনেকটা পরিমাণে পাকিয়া যায় সে বয়সের লাভ পুরা লাভ নহে। যে কাঁচা বয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে তখনি সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে মাঠ শস্যশূন্য অনুর্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে তাহার হিসেব কে রাখে।

এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়ে যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনা-শক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবনাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র-অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়, আমরা নকল করি, নজির খুঁজি এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি তাহা হয় কোনো - না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশত বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে, এ কথা কোনো মতেই স্বীকার্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।

আর -একটি কথা। শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে স্যাক্স্ন করিবার চেষ্টায় তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষা ব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক হইতে খর্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসনবিভাগের আপিস-ভুক্ত করিয়া লইতে চান। এখন হইতে অনভিক্ষ ডাইরেক্টরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাক্মিলানে কোম্পানির রচিত, অতি সংকীর্ণ, অতি দরিদ্র এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালির ছেলেকে মানুষ হইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের বইগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত ও নির্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চা পোলিটিক্যাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।

শুধু তাই নয়, ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাকে যে পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে — ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষীর চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে।

তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায় তবে ইহাই এক দিন চরিত্র এবং বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতাসৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির শুভ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এইজন্য বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন। ইংলন্ডে এই ক্ষমাগুণের চর্চা যথেষ্ট দেখা যায় — এমন কি, আমাদের কাছে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলন্ডের যখন সুদিন ছিল তখন ইংলন্ডও কোনো জাতি সম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না, ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে — এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্মেন্ট্ প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিন্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল তাহা আমি মনে করি না। গবর্মেন্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্মেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্য-স্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি তখনি আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয় তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশী লোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, মানুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবনা এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব — হহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছে, অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার — বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।

বর্তমান কালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টল্স্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি । —

it seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avioding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and well therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo-educational establishments which it controls: schools, high schools, universities, academics, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Dournovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on that struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make. .

শিশুদের মনের জানালা

আমি দীপালি নন্দী কাজলা জনকল্যান সমিতি পরিচালিত তপোবন শিশু আবাসনের সুপারিনটেনডেন্ট। আমি এই সংগঠনে কাজ করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। তেমনি অনেক ভালো মানুষের ও সংগঠনের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। তার মধ্যে ওয়েবেন অন্যতম। যা আমার কাছে বড় পাওয়া। সেই সঙ্গে অনেক শিশুর মধ্যে থাকতে পেরেছি, মতামত শুনতে পেরেছি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি যার জ্বলন্ত উদাহরণ তপোবন শিশু আবাস ।

কোভিড-১৯ সময় কালটি দেখতে দেখতে ১০ মাস অতিক্রম হতে চলেছে, এতদিন সকলে গৃহবন্দী ছিল যদিও বর্তমানে একটু স্বাভাবিক হয়েছে। স্বাভাবিক হয়নি শিশুদের লেখাপড়া, স্বাভাবিক হয়নি শিশুদের শৈশবের স্বাভাবিকতা। একদম গৃহবন্দী, শিশু আবাসনের শিশুরা যেন একটি কারাগারের সদস্যগণ। যাদের মনের জানালা আমরা বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারছি। ২৪ ঘন্টাই একটা রুটিনের মধ্যে চলতে হয় কোভিড-১৯ এর দয়ায়।। যাদের মন ভালো রাখার পথ খোলা ছিল বিদ্যালয়ে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করা, প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত আকাশের নিচে থেকে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়া। তাদের মনের কথা একটু শুনি, এই কোভিড-১৯ এ তাদের মনের অবস্থা কেমন ছিল -

ক) প্রথম প্রথম খুব মজা হয়েছিল যে বিদ্যালয় বন্ধ, প্রতিদিন শিক্ষক শিক্ষিকাদের দাঁত খিঁচুনি খেতে হবে না। নিজের মত করে সময় কাটাতে পারবে।

খ) আমাদের কোচিং এ লেখাপড়া করতে থাকল পড়তে গিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল পড়া তো হয়েছে একটা অনুশীলনী ও পূর্বপাঠের পুনরালোচনা পড়ব কি। কতদূর পড়ব। পরীক্ষায় কোনটা আসবে, কোনটা আসবে না। উত্তর দিতে পারলাম না। বললাম পর পর পড়ে যা। অনীহা তৈরি হল।

গ) বেস নিয়ে ক্লাস নিতে শুরু করলাম।

ঘ) প্রথম প্রথম শিশুদের জন্য চাল, ডাল, ছোলা, সাবান, মাস্ক, স্যানিটাইজার অনেক কিছু দেওয়া শুরু করলেন, তার সঙ্গে প্রশ্নপত্র দিতে শুরু করলেন, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের দিদিমনি বললেন পরের দিন উত্তরপত্র না দিলে কোন জিনিস দেওয়া হবে না। করাতে গিয়ে শিশুরা বলতে লাগল কি করে করব কোথা থেকে এসেছে জানি না। অনীহা তৈরি হল। যদিও জমা দেওয়া হল তার কোন ফিডব্যাক পাওয়া গেল না। মনে করতে লাগল এটা একটা ভাওতা। এর পরে জানতে পারল পরীক্ষা হবেনা । ধীরে ধীরে লেখাপড়ার প্রতি অনীহা তৈরি হল।

ঙ) এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা চাতক পাখির মত তাকিয়ে থাকল পরীক্ষা নিয়ে কি সিদ্ধান্ত, শেষমেস জানতে পারল ফাইনাল পরীক্ষা হবে জুন মাসে, তারপর আবার সিলেবাস অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে, শিক্ষকদের কাছ থেকে জানা গেল, যে বিষয়গুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলো থেকে সাধারণ ছেলেরা খুব একটা নাম্বার পেতে পারবে না।

চার দেওয়ালের মধ্য থেকে শিশুদের প্রতিক্রিয়া -

ক) মনে মনে রাগ তৈরি হচ্ছে, রাগের প্রতিফলন ঘটছে নিজেদের মধ্যে সামান্য কথায় মারপিট লেগে যাচ্ছে।

খ) বাড়ি যাওয়া হবে না জানে, যেখানে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখাও করতে পারছে না, এলে ঘুরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছে। মনে হতাশা তৈরি হচ্ছে।

গ) সবসময় কিছু না কিছু কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে সময় কাটানোর জন্য।

ঘ) নানা আছিলায় বাইরে বেরোনোর জন্য বায়না করছে।

ঙ) সবসময় টিভি দেখার বায়না করছে।

চ) সবসময় বলছে একদম ভালো লাগছে না কোথাও নিয়ে চল না।

চার দেওয়ালের মধ্য থেকে ও এত যন্ত্রণার মধ্য থেকে ওদের কর্মকাণ্ড শুনি

ক) ২টি প্রদর্শনী করেছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যা প্রশংসনীয়

খ) কলাকেন্দ্র

গ) ওদের লেখা অভিজ্ঞতা, গল্প, ক্যুইজ, কবিতা, অঙ্কন বিষয়গুলিকে নিয়ে একটি পুস্তিকা তৈরি করেছে, দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করেছে।

ঘ) অনেক নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে।

ঙ) প্রতিযোগিতা করা বিভিন্ন বিষয়ের উপর।

চ) বাগান তৈরি।

ছ) নিয়মিতভাবে লেখাপড়ার মধ্যে থেকে পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ করা।

জ) হোম ডেকোরেশন

ঞ) বৃত্তিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনেক আকর্ষনীয় জিনিস তৈরি করেছে।

আমার বড়দের কাছে অনুরোধ - আমরা মুখে শিশুদের অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে একটু ভালোবাসা, সুন্দর পরিবেশ, শিশুদের মতামত ও মনের কথা জেনে কাজ করলে অনেক কঠিন মুহূর্তকে জয় করতে পারবো। যার জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরলাম।

দীপালি নন্দী, তপোবন শিশু আবাস, কাজলা জনকল্যান সমিতি

হারিয়ে গেছে গ্রাম্য খেলা

তপন কুমার দাস

বর্তমান সময় হলো নানা প্রযুক্তির ব্যবহারের সময়। শিশুদের এক সময়ের গ্রাম্য খেলা আজ প্রায় লুপ্ত হয়েই গেছে। কিন্তু এমন কিছু বেশি সময় নয় চার-পাঁচ দশক আগেও ছিল এই খেলা। যে খেলায় অংশগ্রহণ করে শিশুরা আনন্দ পেত । সেই আনন্দের সঙ্গে তাদের শারীরিক ব্যায়ামও হয়ে যেত গুপ্তভাবে। শিশুরা চঞ্চল একথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু সেই চঞ্চলতা আজ গৃহবন্দী। পিতা-মাতার এক সন্তান, সেই সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে অনেক বাড়িতে নাকি দাদু-ঠাকুমাদের সংস্পর্শেও আসতে দেন না তাদের পিতামাতারা। দাদু-ঠাকুমার কাছ থেকে শিশুবেলায় নানা গল্প শুনে শিশুমনের অজান্তে যে কল্পনা শক্তির বিকাশ হতো, আজ বর্তমান সময়ে সেই কল্পনাকে আধুনিক মানুষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। রাজা-রাণী, রাক্ষস-খোক্কস, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর কাহিনী আজ যে মূল্যহীন হয়ে গেছে শিশুর মন থেকে। তারা আজ স্মার্টফোন, কার্টুনে নিজেকে করেছে ব্যস্ত। শারীরিক পরিশ্রমে প্রথম জীবনে যে শরীর গড়ে উঠত শক্তিশালীভাবে, আজ বিজ্ঞাপনে বেবি ফুডে সেই শরীর হচ্ছে মেদবহুল। একটু বড় হয়ে শিশু যখন বাইরে বেরোয় তখন সামান্য হাঁটাহাঁটিতে সে হয়ে পড়ে ক্লান্ত! কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। মুক্ত ক্রীড়াঙ্গনে যখন নির্মল বাতাস নিয়ে শিশুর ছোটাছুটি করার কথা সে তখন চাউ বা ম্যাগি গলার্ধকরণ করে বাবা বা মায়ের হাত ধরে চলেছে গান, আঁকা কিম্বা নাচের ক্লাসে অথবা বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের কাছে। একটু দৌড়-ঝাঁপ করলে বাবা-মা হা-হা করে এগিয়ে আসে। সন্তান হয়তো চোট পাবে, তার চেয়ে হাতে রিমোট তুলে দেওয়া ভাল। টিভির পর্দায় চোখ রেখে রেখে সে দৃষ্টিশক্তির অপব্যয় করছে সেও ভাল, কিন্তু বাইরের মুক্ত আলো-বাতাস গ্রহণ করতে দিতে নারাজ অভিভাবকরা।

একটা সত্য ঘটনা অবতারণা করা যায়। সদ্য প্রয়াত এক ফুটবল প্রশিক্ষক গল্প করে বলেছিলেন। ছোট ছোট ছেলেদের মাঠে খেলা শেখাচ্ছি বিকেলে। একটি শিশুর হাত ধরে মা তাকে নিয়ে চলেছেন কোচিং সেন্টারে, ভবিষ্যতের 'মানুষ' গঠন করতে। কিন্তু শিশু মন তো চায় তার বয়সী যে সকল শিশু উন্মুক্ত পরিবেশে খেলা করছে তাদের সঙ্গী হতে। তাই শিশুটি বারবার থেমে পড়ে, তার মন হয়েতো চায় তার বয়সী শিশুদের সঙ্গে খেলায় অংশ নিতে। কিন্তু তার অভিভাবক মনে করেন এটা হয়তো সময়ের অপচয়, তাই বারবার শিশুটির হাতে টান দিয়ে নিয়ে চলেন তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করার তাগিদে। শিশুটি তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে।

এবার আমাদের শৈশবে ফেলে আসা খেলাগুলির একটু আলোচনা করে নিই। আসলে গ্রামীন খেলা বিলুপ্ত হতে হতে আজ তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই কঠিন। গ্রাম বাংলার পাড়া গাঁয়ে যেসব খেলা হারিয়ে গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - হা-ডু-ডু, কাবাডি, বুড়িবসন্ত, কাঁনামাছি, হাঁড়ি ভাঙা, রুমাল চুরি, এলাডিং বেলাডিং, আগডুম-বাগডুম, ইকাড়ি-মিকড়ি, ব্যাঙের মাথা, চু-কিৎ-কিৎ, ডাংগুলি, ডব-ডবা-ডব, মোরগ-লড়াই, এক্কা-দোক্কা, লাঠিখেলা, পুতুল খেলা, মার্বেল-গুলি, নৌকা-বাইচ, ধাসা ইত্যাদি। আবার একই খেলায় বিভিন্ন জেলাভিত্তিক নামকরণও আলাদা। এছাড়া একটু বড়দের ফুটবল, ভলিবল ও ক্রিকেট খেলা তো আছে। এক জায়গায় বসে বাঘবন্দী, দাবা, তাস, চোরপুলিশ খেলাও একসময় খুব চলত। লুডো খেলা ও ক্যারাম খেলাও এর মধ্যে পড়তো।

নতুন প্রজন্মের শিশুদের কাছে এসব খেলা এখন তো শুধু গল্পই। আবার খেলার নাম শুনে অনেকেই হাসে। অবিভক্ত বাংলায় সাত-আট দশক আগে হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, বৌচি, ডাংগুলি ছিল খুবই জনপ্রিয় খেলা। ওই সব খেলা চলার সময় খেলা দেখতে শত শত মানুষ হাজির হতেন। কালের প্রবাহে এখন মাঠের সংখ্যাও কমে এসেছে তাছাড়া টিউশন নির্ভর পড়াশুনায় শিশুদের খেলার সময়ই বা কোথায়! সেই সময় শিশুদের পড়াশুনা ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে কোনও ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্য থাকত না। ফলে যে যেমন পারে স্কুল ফেরত খেলাধূলায় সময় কাটিয়েছে। এমনকি স্কুলে টিফিনের অবসর সময়ে বা অনেকসময় একটা পিরিয়ড বাদ দিয়েও লুকিয়ে বালকরা খেলাধূলা করেছে।

কিছু খেলা আছে যেগুলি সাধারণত মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতো। সেই সময় মেয়েরা সচরাচর ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতো না বলেই বাড়ির দাওয়ায় বা উঠোনে নানা ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করতো। অবিভক্ত বাংলায় তৎকালীন যে দুটি খেলা বালিকাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল সে দুটি হল 'টোপাভাতি' ও 'পুতুল খেলা'। এছাড়াও তারা এক্কা- দোক্কা, কড়ি খেলা, ঘুঁটি খেলা, এলাটিং-বেলাটিং সইলো ইত্যাদি খেলা খেলতো। পুতুল খেলা খেলেনি এমন মেয়ে পাওয়া খুবই দুষ্কর। বাড়িতে মাটি, কাঠ কিংবা কাপড় দিয়ে ছোট ছোট মানুষ আকৃতি পুতুল তৈরি করতো, সেই পুতুল নিয়ে ঘরসংসারে নানা ধরনের খেলা চলতো। বর্তমানে অবশ্য বড় বড় প্লাস্টিকের পুতুল বা কাপড়ে পশু নিয়ে শিশুরা নিজে নিজে নিস্প্রাণভাবে খেলে থাকে। রান্না-বান্নার খেলাও মেয়েদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। বর্তমানে কিছু কিছু প্লাস্টিকের পাত্রে সেই খেলা শিশুরা খেলে থাকে। এছাড়া তখন কাপড়ের পুতুল বানিয়ে, বর-কনে, সন্তান-লালন পালন করা, নানা রান্নার খেলাও চলতো। শিশুরা আপন মনে স্নেহে যত্নে সেই পুতুলগুলিকে নিজ সন্তান মনে করে শিশু মনে খেলতো। শিশু পুতুলদের আদর সোহাগ যেমন চলতো তেমনি বকা-ঝকাও দেওয়া হত। ছড়ার মাধ্যমে পুতুলের বিয়েও দেয়া হত।

'টোপাভাতি' হল রান্না খেলা। টোপা অর্থাৎ মাটির হাঁড়ি বাসন আর 'ভাতি' মানে ভাত রান্না করা। কঞ্চি বা গাছের ডাল দিয়ে ঘরের ঘুঁটি করে উপরে পাতা বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি হতো ছাউনি দেওয়া ঘর। ঘর লেপা, চুলা তৈরি, খুদ দিয়ে ভাত রান্না, ধূলো বা ছোট কাঁকড় জাতীয় জিনিসকে চিনি বা লবন ও গাছের বড় পাতা কেটে পাত্র তৈরি হতো, রাবণ লতার সাদাফুল বা ফুল গুচ্ছকে সবজি বানিয়ে রান্নার কাজ চলতো। রান্না হয়ে গেলে সকলে মিলে বসে খাওয়া দাওয়ার ভান করতো। আসলে সবটাই অভিনয়। তিনটি ছোট ইটের টুকরোর উপর হাঁড়ি বসিয়ে উনানে পাতা জাল দেওয়া হতো। অর্থাৎ পুরো খেলাটাই ছিল সমস্ত সংসারকে তুলে ধরা। বড় অদ্ভুত তাদের ধারণা থাকত 'এক্কাদোক্কা' বা 'চাড়া' খেলা ছিল মেয়েদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। ভাঙা মাটির হাঁড়ি বা কলসির টুকরো দিয়ে চাড়া বা ঘুঁটি বানিয়ে বাড়ির উঠোনে কিম্বা খোলা জায়গায় আয়তাকার দাগ কেটে খেলা হতো এক্কা-দোক্কা বা চাড়া। ঘরের মধ্যে আড়াআড়ি দাগ কেটে তৈরি করা হতো আরও ৬টি খোপ। বেশ সরল নিয়মে এই খেলাটি পায়ের আঙুল দিয়ে একা একাই বা দলগতভাবে খেলা যায়, প্রতিযোগিতাও করা যায়। এক এক ঘরে খোলামকুচি বা চাড়া ছিঁড়ে এক এক পায়ে লাফ দিয়ে দাগ পার হয়ে ওই খোলমকুচি পায়ের আঙুলের টোকায় ঘরের বাইরে আনতে হয়। আঙুলের টোকায় চাড়াটি বা খেলামকুচিটি কোনও দাগের উপর পড়লে বা দুই পাশের রেখা পার হয়ে গেলে খেলোয়াড় দান হারায়। তখন দান পায় দ্বিতীয়জন। এভাবে যে প্রথম সব ঘর পার হয়ে আসবে সেই এক্কাদোক্কা খেলায় জিতে যায়।

এছাড়া মেয়েদের আরেকটি জনপ্রিয় খেলা ছিল 'গুটি খেলা'। সাধারণত ১০-১২ বছরের মেয়েরা এ খেলাটি খেলতো। অনেক জায়গায় আবার 'একে কুত্তা' খেলাও বলা হয়। ইট বা পাথরের ৫টি টুকরো নিয়ে এটি খেলে। শুরুতে এই গুলিগুলি মাটিতে ছড়িয়ে ফেলতে হয়। তারপর মাটিতে ছড়ানো গুটি থেকে একটি হাতে নিয়ে তার উপরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। ছুঁড়ে দেওয়া গুটিটি মাটিতে পড়ার আগেই ওই গুটিসহ মাটিতে ছড়ানো এক বা একাধিক গুটি হাতে তুলতে হয়। মাটি থেকে ছড়ানো গুটি খুঁটে খুঁটে তোলা হয় বলে একে 'খোঁটাখুঁটি' খেলাও বলা হয়। এই খেলার সময় ছড়া আবৃত্তি করা হয়। বোঝা যায় খেলার সঙ্গে ছড়ার মধুর সম্পর্ক রয়েছে। তাই ছড়া আবৃত্তি না করলে খেলাটি মোটেই জমে না। খেলাটি একাই, দোকাই, তিনাই, চারাই ও পাঁচাই বা পঞ্চম-এই পাঁচটি স-রে বিভক্ত। প্রথমে একটি করে উড়ানো গুটি তোলা হয়, এরপর দুটি করে, এভাবে পাঁচটি গুটি তোলা হলে খেলা শেষ হয়। মনোযোগ ও হাতের ক্ষিপ্রতা ও দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে এ খেলার জয় পরাজয়।

এবার প্রবন্ধের ইতি টানি। পড়াশুনা যেমন ছেলেমেয়েদের মানসিক বা বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটায়, তেমনি শারীরিক বিকাশ ঘটাতে খেলাধূলার কোনও বিকল্প নেই। বর্তমানে ভিডিও গেম, টিভি, মোবাইল ফোন গ্রামীন খেলাধূলার স্থান দখল করেছে। গ্রামীন খেলাধূলার সঙ্গে রয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের নাড়ির সম্পর্ক। তাদের স্মৃতি ও ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আজ লুপ্ত হতে চলেছে। সময়, চাহিদা ও পরিস্থিতি নানা বিষয়ের পরিবর্তন আনে। পুরনোকে ফেলে নতুনকে বরণ করে নেয়। তবে সেটা যাতে শিশুর সর্বাঙ্গিক বিকাশের অন্তরায় না হয় সেটা আমাদের দেখা উচিত।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক–এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা–৭০০০৩১ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
দূরভাষ: ০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল: wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট : wben.info মুদ্রণে: শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ: ২২৪১ ৯৬৩৩ *অনুদান* : ৬ *টাকা*
কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য